বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন

হিন্দোল ভট্টাচার্য

একজন কবি, তাঁর কাব্যব্যক্তিত্ব নিয়ে খুব ভাবিত হন না, কিন্তু গুরুত্ব দেন অবশ্যই। না হলে, স্বতন্ত্র কাব্যভাষা, স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত হওয়ার কথাই বা কেন তিনি ভাববেন। লেখার সময়েই ভাবনাকে প্রতিনিধিত্ব করার সময় তাঁর ভিতরে একপ্রকার মূর্খ এবং সামাজিক দুই সত্তাই কাজ করে। সামাজিক সত্তা তাঁকে বলে তোমার কবিত্বই হয়ে উঠুক তোমার সামাজিক চিহ্ন। আর একধরনের প্রবণতা কাজ করে, যে বলে, তোমার কবিত্ব হয়ে উঠুক তোমারই মূর্খ বিস্মিত এক সত্তার প্রতিনিধি।

প্রকৃতপক্ষে কবি নরেশ গুহ হয়ত এসব কিছুই ভাবেননি। যে কারণে কবিতা ও কবি সম্পর্কে যে কোনও আলোচনাই হল অন্তঃসারশূন্য কিছু শব্দ ও বাক্যের ব্যায়াম। কারণ কে কেমন ভাবে একটি কবিতাকে দেখবে বা পড়বে তা তার মানসিক বিপন্নতা বা স্থৈর্য — এসবের উপর নির্ভর করে। সবার পক্ষে সব শিল্পমাধ্যমের সৃজন যেমন সম্ভব নয়, তেমনই সবার পক্ষে সব শিল্পমাধ্যমের আস্বাদনও সম্ভব নয়। অতি অল্প কয়েকটি কবিতা লিখেছেন কবি নরেশ গুহ। সর্বসাকুল্যে হয়ত তার সংখ্যা ৮০ থেকে ১০০। ১৯৫২ সালে তাঁর 'দুরন্ত দুপুর' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতা ও সাহিত্যের যে মহল সেখানে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। প্রচুর আলোচনা হয়েছিল তাঁকে নিয়ে। কিন্তু এর পরের কবিতার বই 'তাতার সমুদ্রঘেরা' প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। ভেবে দেখুন পাঠক, আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ২৪ বছর পর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের কথা ভাবতে পারছেন! কিন্তু নরেশ গুহ ভাবতে পেরেছিলেন। অথচ এই সময়ের মধ্যে তিনি লিখেছেন অজস্র গবেষণাপত্র, গদ্য, প্রবন্ধ, পড়িয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের। গেছেন দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায়। বয়স বেড়েছে। অভিজ্ঞতা বেড়েছে। কিন্তু তিনি খুব বেশি কবিতা লেখেননি।

যাঁরা জীবনের প্রতি মুহূর্তকেই কবির অনুভূতিমালা দিয়ে দেখেন, বোধের জগতের ভিতরে ডুবে থাকেন এবং বোধকে বাক্য কাব্যমুহূর্তের মধ্যে দিয়ে অনূদিত করতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে কবি নরেশ গুহর একটি পার্থক্যের জায়গা রয়েছে। তাঁর জীবনে লিখিত কবিতার ইতিহাসের চেয়ে না লেখা কবিতার ইতিহাস দীর্ঘ। একজন কবির কাছে এই না লেখা কবিতাগুলিই শেষ পর্যন্ত একটি প্রধান ভূমিকা হিসেবে কাজ করে। মনে মনে হয়ত একটি কবিতা রূপ পাচ্ছে। কিন্তু কবি সেই রূপ পাওয়া কবিতাকে কবিতার মহাসমুদ্রের উপযোগী একটি অমোঘ কবিতা হিসেবে মনে করছেন না। ফলে তিনি মন থেকেই সেই কবিতাটিকে বাতিল করছেন। অর্থাৎ তাঁর মনের মধ্যে রয়েছেন এক প্রাজ্ঞ সম্পাদক, যিনি অমোঘ কবিতা এবং কবিতার মধ্যে একটা পাঁচিল খাড়া করে দিচ্ছেন। যিনি সম্পাদনা করে দিচ্ছেন কোনটা লিখিত হবে এবং কোনটা লিখিত হবে না। নরেশ গুহর মতো সাহিত্য সম্পর্কে প্রাজ্ঞ একজন ব্যক্তির কাছে এই

সম্পাদনা আশা তো করাই যায়। তিনি যে শুধু একজন স্বভাবকবি ছিলেন না, যেমন আধুনিক কবিতায় কেউই স্বভাবকবি নয়। ঘটনার বিবরণকে বা সংবাদপত্রের পাতা থেকে ন্যারেটিভ তুলে এনে তাকে ছন্দবদ্ধ বা গদ্যে আবদ্ধ কবিতার পংক্তি করে ব্যবহার করে হাততালি কুড়োতে চাননি। তিনি হয়ত জানতেন কবিতা এবং ন্যারেটিভের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পর্দা রয়েছে। কবিতা তাইই, যা নিজে সম্পূর্ণ কবিতা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়।

কিন্তু বিশুদ্ধ কবিতার সঙ্গে নরেশ গুহর কবিতার পার্থক্যও রয়েছে। মনে রাখতে হবে, নরেশ গুহ-র পূর্বের দশকেই আমরা পেয়েছি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসুদের। নরেশ গুহদের সময়ে কবিতা অনেক বেশি ব্যক্তিগত অনুভূতিমালাকে প্রকাশের দিকে ঝুঁকে এল। নরেশ গুহর 'দুরন্ত দুপুর' পড়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, ''ভালো লেগেছে সেই কবিতার স্নিগ্ধতা, স্বপ্নিলতা, রচনাশিল্পের সৌষ্ঠব। ভালো লেগেছে লিরিকের দিকে ঝোঁক। নীচু গলায় নরম করে বলার দিকে উন্মুখতা। 'দুরন্ত দুপুর' স্নিগ্ধ মধুর রসের কাব্য। একটি ব্যথিত হৃদয়ের স্বগতোক্তি ওখানে শুনতে পাই আমরা। — কিন্তু ব্যথিত বলে বিক্ষুব্ধ নয়।'' এই লেখা লিখিত হওয়ার প্রায় ষাট বছর কেটে গেছে। সেই কাব্যগ্রন্থ এখন যদি আমরা পড়তে বসি, তাহলেও সেই একই অনুভূতিমালার কথা মনে হবে।

১) আমাকে আদর করার মন্ত্র সে বুঝি জানতো। / সে অপার্থিব, সে অফুরন্ত। / সে যেন আমার লক্ষ্যবিহীন সকল গানের / অকূল মোহানা। সে যেন আমার অধীর প্রাণের / চিরপ্রতীক্ষা। (এক বর্ষার বৃষ্টিতে)

২) হে অনন্ত একতারার সুর / হে রাত্রিশেষের তারা / ক্ষীণ আয়ু, হে অশ্রুবরণী / বসন্ত ব্যাকুল শাখা সর্বপত্রহারা– / দাও, গান দাও (প্রার্থনা)

৩) ভরা বুক কাটে সাঁতার। / পিতলের হাঁড়ি, বিছানা চাদর / পোষা ভেড়া গরু কুড়ায় আদর। / ঘুম চোখে নেই;''

৪) উপচার গ্রহণের আমার যে উত্তরাধিকার / সে-কথা জেনেছি আমি। সেই সঙ্গে জানি, / আরতির শেষে / বিসর্জনের সুর উদ্দাম ঢাকিরা অনায়াসে / একদা বাজাবে। (আমার বন্ধুকে)

এই সব কটি কবিতাই নেওয়া হয়েছে 'দুরন্ত দুপুর' নামক আশ্চর্য এক কাব্যগ্রন্থ থেকে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি নরেশ গুহ এমন এক শান্ত পুকুরের মতো জলের বা ধীরে ধীরে বয়ে যাওয়া নদীর স্রোতের মতো কবিতা লিখেছেন, যে জীবন সেখানে নিজে থেকেই নিজের সঙ্গে কথা বলে। তাঁর এই কবিতাগুলির ভিতর প্রবেশ করলে অতি অল্প সময়েই স্থান-কাল-পাত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। সবথেকে বড় কথা, নরেশ গুহর কবিতায় কোথাও কোনও রাগ নেই, তির্যকতা নেই। ছোট ছোট কবিতার মুহূর্তের মধ্যে অবগাহন করে তিনি এমন সব চিত্রকল্প রচনা করেছেন, যেগুলি দেখলে কাব্যপ্রতিমার থেকেও চিন্তাপ্রতিমার কথা মনে পড়ে সহজেই। স্থির জলে পাথর ছুঁড়ে মেরে যে চঞ্চলতা সৃষ্টি করা, তাও তিনি করেননি। তিনি অভিনব চিত্রকল্প বা ছন্দ বা কাব্যভাষার দিকেও ঝোঁকেননি। তিনি শুধু অন্তর্গত সংলাপের কাজটিই চালিয়ে গেছেন আজীবন। 'দুরন্ত দুপুর' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে এই অন্তর্গত সংলাপের এক মানচিত্র তৈরি হচ্ছে। শাশ্বত কিছু অনুভূতির কথাই তাঁর কবিতাগুলির ভিতরের ভাবনা। কিন্তু তা কেমন করে বলছেন, সেখানেই কবিতার সিদ্ধি। নরেশ গুহ-র মতো কবি, যিনি সংযমকেই তাঁর জীবনের এক ধ্রুবতারা করে নিয়েছিলেন, তিনি তাঁর কবিতাগুলির ক্ষেত্রেও প্রথম থেকেই নির্মেদ এক কাব্যভাষাই অনুসরণ করে গেছেন। বাড়তি একটুও মেদ নেই। সুসম্পাদিত সব কবিতা। পাঠক হিসেবে আমি ঠিক জানি না, তিনি কতবার কবিতাগুলি সংশোধিত করেছিলেন। কিন্তু এ কথা তো বোঝাই যায়, তাঁর এই নির্মেদ কবিতাগুলি রচনার পিছনে দীর্ঘ দিনের সম্পাদনাও কাজ করছে। গীতিকবিতার মাধুর্যের কথা

বললে, নরেশ গুহর কবিতা সেই মাধুর্যকে তাঁর কবিতাচর্চায় ধারণ করেছিলেন আজীবন। এ ক্ষেত্রে পাঠক হিসেবে যে ভাবনা মনের মধ্যে ভিড় করে আসে, তা হল, যেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সমকালীনতা দিয়ে ব্যথিত হচ্ছেন, ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, যন্ত্রণাদগ্ধ হচ্ছেন, জীবনানন্দ-র মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমিরে দেখতে পাচ্ছি সমকালীন সময় রয়েছে ছত্রে ছত্রে, সেখানে নরেশ গুহর কবিতা এত প্রশান্তি পেল কোথা থেকে? তাঁর কবিতায় সমকালীন যন্ত্রণা কই? হতেও পারে, সমকালীন অস্থিরতা বা যন্ত্রণা বা পূর্বে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল বলেই, তিনি প্রশান্ত ব্যক্তিমনের যন্ত্রণা ও অভিজ্ঞতাই লিখেছেন। এখানে তিনি এবং প্রকৃতি, তিনি এবং প্রেম। অথচ সেই সব অনুভূতিমালা অনন্তের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। সমকালীনতাকে ধারণ করে তিনি একটি অল্টারনেটিভ বাস্তবতা তৈরি করছেন এবং বলছেন, এটিও তো রয়েছে আমাদের মধ্যেই। আমরা কি তবে একে নিও-রোমান্টিসিজম বলতে পারি?

'দূরে এসে ভয়ে থাকিঃ সে হয়তো এসে বসে আছে' (শান্তিনিকেতনে ছুটি) কিংবা 'আমি যদি হই ফুল, হই যদি বুলবুলি-হাঁস' (রুমির ইচ্ছা)-এর কথা যদি আমরা ভাবি, তাহলে সেই নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটির কথাই হয়তো মনে পড়বে আমাদের। কিন্তু 'দুরন্ত দুপুর'-এর এই প্রশান্ত ধ্যানী প্রেমিকের জায়গা থেকে তিনি হয়ত পরবর্তীকালে বেরিয়েছিলেন। বেরতে নরেশ গুহর মতো কবির সময় লেগেছিল। নরেশ গুহর বিবিধ প্রবন্ধগুলির দিকে তাকালে হয়ত তাঁর ভাবনাজগতের কিছু কিছু হদিশ আমরা পাব। যদিও তিনি সরাসরি নিজের কথা তেমন লিখছেন না। কিন্তু অন্যান্যদের কীভাবে পড়ছেন, তাও অনেক সময় একজন কবির ভাবনাজগতের নানা ক্ষেত্র আমাদের কাছে তুলে ধরে।

'ছেড়ে আসা গ্রাম' নামে এক অসামান্য গদ্যে তাঁর মনের অনেক গভীর স্মৃতিকাতর দিক উন্মোচিত হয়। যেমন এক জায়গায় তিনি লিখছেন, ''সময় অস্থির — জীবন অস্থির। যারা গেছে, তাদের আর এ জীবনে খুঁজে পাওয়ার সময় হবে না। জননী আর জন্মভূমি। মন বলে ওঠে — যাই — আর একবার যাই।" কথাটি হল, যে মন বিশ্বের বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক দর্শন নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করে, সেই মনের এই যে গভীর মনখারাপের জায়গা, সেই জায়গা থেকেই তিনি একটির পর একটি কবিতা লিখে গেছেন। হয়ত তা সংখ্যায় অনেক বেশি নয়। হয়ত সর্বসাকুল্যে কম বেশি ৮০, কিন্তু তার মধ্যেই নরেশ গুহর মন প্রতিফলিত। 'দুরন্ত দুপুর'-এর পর তিনি তাই ২৪ বছর সময় নিয়েছিলেন দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আগে। কেন তিনি এতটা সময় নিলেন? ৫২-তে যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরোল তার কয়েক বছর আগে ভারত স্বাধীন হয়েছে। দেশভাগ হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। আবার ৭৬-এ যখন তিনি 'তাতার সমুদ্রঘেরা' প্রকাশ করলেন তখন জরুরি অবস্থার সময়। নকশাল আন্দোলনকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে হত্যা করেছে ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তি। আমরা দেখেছি হিংস্র এক দেশের ছবি। এই হিংস্রতা ঔপনিবেশিকদের হিংসা নয়। এই হিংসা আমাদের দেশেরই দালাল, জোতদার, পুঁজিপতি এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের। চিন্তাধারাও কিছুটা পালটাল; অবশ্যই। ''তাতার সমুদ্রঘেরা জননী বসুধা একাকিনী / উদাসীন ধুলোর প্রাঙ্গণ।" লক্ষ করার মতো বিষয় নরেশ গুহর দুরন্ত দুপুরের নিও-রোমান্টিসিজম ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু পিছু ছাড়ছে না। কারণ রোমান্টিসিজমই তাঁর কবিতার আত্মা। আজকের ভাষায় তাকে আমরা ডিএনএ-ও বলতে পারি। ''ধ্বসে পড়ে দিন রাত, আলো ফাটে, ছায়া দীর্ঘ হয় / শান দেওয়া অন্ধকারে ক্ষয়ে যায় নক্ষত্রবলয়। / তৃষ্ণার সমুদ্র থেকে সূর্য তোলে দানবের চোখ।" এই কাব্যগ্রন্থটির ভাষা নরম। ভাষায় আগুন নেই। ভাষায় চোরা বিষণ্ণতা আছে। আবার এক জেগে ওঠাও আছে। কারণ আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়, বুদ্ধদেব বসু এবং অমিয় চক্রবর্তী ও বিশ্ব কবিতা ও সাহিত্যের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে ধারণ করে থাকলেও, নরেশ গুহ আত্মিক ভাবে মিশে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। অমিয় চক্রবর্তীর প্রভাব হয়ত কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের প্রভাব খুবই অল্প।

নিও-রোমান্টিসিজমের ভাবনায়, নরেশ গুহ তৈরি করে নিয়েছিলেন এক অনুচ্চকিত কাব্যভাষা ও কাব্যব্যক্তিত্ব। যা কোনওমতেই পাঁচের দশক কিংবা সাতের দশকের সঙ্গেও খাপ খেত না। কিন্তু এ বিষয়ে সময়ের প্রবাহকে অস্বীকার না করেও মানসিকভবে তিনি গ্রহণও করেননি। তাঁর কবিতায় অস্তিত্ববাদ এসে বাঘের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। বোদলেয়ারীয় অশুভ ও অমঙ্গলবোধের আধুনিকতার বিশ্ব থেকে তিনি অনেকটাই দূরের মানুষ। কাব্যকাঠামোয় এবং লিখনে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেও তিনি রবীন্দ্রদর্শনকে আত্মীকরণ করে নিয়েছিলেন বলেই আমার বিশ্বাস। নরেশ গুহর কাব্যধারাকে ভাল করে বুঝতে তাই আমি পাঠক হিসেবে যেতে চাই তাঁর গদ্যরচনার কাছে। যেখানে তিনি কবি এবং প্রাবন্ধিক, সেখানে নরেশ গুহ লিখছেন, ''নিজের কবিধর্মে অবিচলিত থেকেও নিজেকে তিনি বিবর্তিত করলেন ঠিকই, কিন্তু নতুন কবিতার প্রতি সন্দেহ তাঁর কিছুতেই গেল না। মনে হলো কড়া ভঙ্গির চমক লাগানো দুর্বোধ্যতা ছাড়া আর কিছু দেবার নেই তাদের। এ দ্বন্দ্বের ইতিহাস 'শেষের কবিতা'র পাতায় প্রচ্ছন্ন আছে। 'শেষের কবিতা'কে তাই অনায়াসে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের শেষের পর্বে রচিত কবিতাবলির মুখবন্ধ।'' এখানে মনে হয়, নরেশ গুহর মনেও এই ভাবনাচিন্তা উঁকি দিয়েছিল। কারণ আমরা যদি সেই সময়কালের কথা ভাবি, তাহলে তা এক বিক্ষুব্ধ সময়। কত অজস্র ঘটনা ঘটছে চারিদিকে। পালটে যাচ্ছে মানুষের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিই। এখানে আরেকটা বিষয়। ভাবার মতো বিষয়। ইয়েটসের কবিতা তাঁকে যেভাবে আচ্ছন্ন করেছিল, এলিয়টের কবিতা হয়ত সেভাবে আচ্ছন্ন করেনি। অথবা, আচ্ছন্ন করলেও এলিয়টীয় আধুনিকতার ভাবনার কথা তাঁর কবিতার মধ্যে প্রভাব ফেলল না। ৫২ থেকে ৭৬-এর মধ্যবর্তী সময়ে উভয় বাংলাতেই ঘটে গেছে অনেক কিছু। মানুষের জীবন জটিল হয়েছে। মানুষ প্রতিরোধও করছে। মানুষ হেরেও যাচ্ছে। ''তাকিয়ে দেখার বেশি অধিকার দেবে না সময়'' লিখেছিলেন কবি নরেশ গুহ তাঁর 'তাতার সমুদ্রঘেরা' কাব্যগ্রন্থেই। এই যে একটি করুণ রাগিনী হালকা করে বাজতে থাকে তাঁর কবিতার ভিতর, সেখানেই লুকিয়ে থাকেন তিনি। কী আশ্চর্য নৈপুণ্যে তিনি তাঁর মেধাবী সত্তাকে ঢেকে রেখেছেন কবিতার সৃজনের সময়। অথবা এও বলা চলে তাঁর কাব্য-ব্যক্তিত্ব, কাব্য-অভিপ্রায়কে ঢেকে রেখেছে কোথাও। যে সমস্ত অনুভূতিমালা শাশ্বত, তার প্রতীকী এক স্তরকেই তিনি উন্মোচিত করলেন মন্ত্রের মতো। যেখানে কোনও সময়ের চিহ্ন জোর করে গলা চেপে ধরে না। সময়ের এবং সমকালীনতা নিয়ে যেমন একজন কবি খনন করে আনতে পারেন অনন্তের কবিতা, ঠিক তেমনই কবিতার স্বার্থেই কেউ অনুভূতিমালার গভীর প্রদেশের দিকেই তাকিয়ে থাকতে পারেন কবিতার জন্য। নরেশ গুহ একজন আদ্যন্ত সৎ কবি। আর সেই সততা এবং প্রজ্ঞাই প্রতিফলিত হয় তাঁর নীরব সংযমের ভিতর।

হিন্দোল ভট্টাচার্য : কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক।